শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতাপ্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড,
কলিকাতা

গীতাপ্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড
কালীঘাট, কলিকাতা

জানুয়ারী, ১৯৪০
মূল্য চার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ

ভাবীসমাজের স্বরূপ কি হইবে সে-সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ কেহ অনুযোগ করিতেছেন, "কোন রূপকারই আগামী কালের পরিপূর্ণ রূপটিকে মূর্ত্তি দিতে পারেন নাই। আজো আকাশে রহিয়াছে অস্পষ্ট কুহেলিকার আনাগোনা; অনাগত দিনের ভাবমূর্ত্তি আজো জমাট বাঁধিয়া দেখা দেয় নাই।" কিন্তু আগামী কালের পরিপূর্ণ রূপটি আগামী কালই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে—তাহার জমাট ভাবমূর্ত্তি পূর্ব্ব হইতে দেওয়া যায় না। তবে কোন্ নীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে, মানব জাতিকে সে-জন্য কোন্ দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—তাহার নির্দ্দেশ দেওয়াই প্রকৃত দিশারীর কাজ। শ্রীঅরবিন্দ যোগলব্ধ দৃষ্টিতে ভাবী সমাজের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ যে সত্য দর্শন করিয়াছেন—সেইটিকে সকল দিক দিয়া যুক্তির সাহায্যে সাধারণের মনের নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য তিনি একাদিক্রমে সাতবৎসর ধরিয়া Arya পত্রিকায় বিবিধ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং সেই দিক দিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পর তিনি ঐ পত্রিকার

প্রকাশ বন্ধ করেন। তাঁহার সেই সব গভীর অভিনব বার্ত্তা লোকে শুনিবে সে সময় তখনও আইসে নাই, তাই Arya পত্রিকার বক্তব্য কেবল কতকগুলি গ্রাহক ও পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সে-সময় আসিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীঅরবিন্দের কোন সম্প্রদায় নাই; কঃ পন্থা, পথ কি—তিনি তাহাই দেখাইয়া দিয়াছেন।

Arya পত্রিকার চতুর্থ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তখন লিখিয়াছিলেন—

"Our idea was the thinking out of a synthetic philosophy which might be a contribution to the thought of the new age that is coming upon us. We start from the idea that humanity is moving to a great change of its life which will even lead to a new life of the race,—in all countries where men think, there is now in various forms that idea and that hope,—and our aim has been to search for the spiritual, religious and other truth which can enlighten and guide the race in this movement and endeavour. The spiritual

experience and the general truths on which such an attempt could be based, were already present to us, otherwise we should have had no right to make the endeavour at all ; but the complete intellectual statement of them and their results and issues had to be found. This meant a continuous thinking, a high and subtle and difficult thinking on several lines, and this strain, which we had to impose on ourselves, we were obliged to impose also on our readers." (July, 1918).

শ্রীঅরবিন্দ সাত বৎসর ধরিয়া Arya পত্রিকায় ভাবী মানব সমাজের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন আমরা দুই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্যক পরিচয় দিব, পাঠকদের সকল সংশয় ও প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিব ইহা সম্ভব নহে। আমরা কেবল সামান্য ইঙ্গিত দিতে পারি, পাঠকদের মনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিলে তাঁহারা নিজেরাই আরও পূর্ণতর পরিচয় লইতে যত্নবান হইবেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সহিত পরিচিত হইতে যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ

সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত সে আগ্রহ দেখান নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বহুলোকই যে ধারণা পোষণ করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও আংশিক।

আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার সহিত বাস্তবজীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই, শ্রীঅরবিন্দ সেই আধ্যাত্মিকতা লইয়া রহিয়াছেন, অতএব যাহারা কাজের লোক, দেশের সেবা, সমাজের সেবা করিতে চান তাহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সংবাদ লইবার কোন আবশ্যকতা নাই, শ্রীঅরবিন্দ এখন একটি back number হইয়া পড়িয়াছেন—অনেকেই এখনও এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সহিত বাস্তবজীবনের কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে, এই জগৎ হইতেছে জীবন ও কর্ম্মের জগৎ—কিন্তু জীবন ও কর্ম্মকে যদি উচ্চ চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করা না হয় তবে মানুষ পশু ও উদ্ভিদেরই সামিল হইয়া পড়ে। মানুষের অন্তরাত্মা ইহাতে সায় দেয় না, কারণ দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের উপরে তাহার মধ্যে রহিয়াছে মন, আত্মা—উচ্চতর আলোক ও প্রেরণার দ্বারা জীবনকে গঠিত ও রূপান্তরিত করাই মানব জীবনের

প্রকৃত লক্ষ্য। তাই আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানে অজ্ঞানে মানুষ সর্ব্বদাই দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলাম, বর্ত্তমান যুগেরই সকল বড় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রভাব। যে ফরাসী বিপ্লব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মানবীয় আদর্শ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে তাহা শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় নাই—সে সব কারণ ইউরোপের ও জগতের অন্যান্য স্থানেও বর্ত্তমান ছিল। সে-সব কারণকে নিমিত্ত করিয়া যে-শক্তি সেই মহান্ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহা আসিয়াছিল রুসো, ভল্‌টেয়ার্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের অভিনব চিন্তাধারা হইতে। বহুদিনের পরাধীন ইটালী ম্যাজিনির দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যে মার্ক্‌স্‌বাদ আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাও মূলতঃ একটি দার্শনিক চিন্তাধারা। আজ জার্ম্মাণীতে যে আসুরিক শক্তির বিরাট অনুশীলন ও অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে তাহার প্রেরণা আসিয়াছে নীট্‌শের অতিমানববাদ হইতে। আর ভারতে একটা সমগ্র জাতি যে ঐহিক জীবনকে অবহেলা করিয়া অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছে তাহার জন্যও

প্রধানতঃ দায়ী হইতেছে তাহাদের দার্শনিকতা। এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় দর্শনকেই প্রধান স্থান দিয়াছিলেন—পত্রিকাখানির পরিচয়ই ছিল—A Philosophical Review.

যাঁহারা বলেন আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য মোটেই নহে, এককালে সকল দেশই সমানভাবে আধ্যাত্মিক ছিল—তাঁহারা ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষ সত্যের দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে তর্কের স্থান নাই। ধর্ম্ম সকল দেশেই আছে, কিন্তু কোথায় কোন্‌টির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়াই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হয়। ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয় বৈদিক যুগে, বেদের সাধনার পরিণতিই উপনিষদ্ বা বেদান্ত। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় কেমন করিয়া একটা সমগ্র জাতি অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল—অন্যান্য দেশে যে-সব নিগূঢ় সত্য কয়েকজন সাধকের মধ্যে গুহ্যভাবে থাকিত, ভারতে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে-সব সত্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতীয় কৃষ্টির ভূমিকে ব্যাপক অধ্যাত্ম বিকাশের জন্য উর্ব্বর করিয়া তোলে। জগতের আর কোথাও এমনটি দেখা যায় নাই।

সেই সময় হইতে ভারতীয় সভ্যতার মূল সুরই হইয়াছে আধ্যাত্মিকতা। অবশ্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও অধিকাংশ লোকই হইতেছে বহির্মুখী, তাহারা "নিশ্চিন্তে বেচাকেনা, হাটবাজার করিয়াই" দিন কাটায়। তথাপি ভারতে তাহাদের অন্ততঃ এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সাধনার ফলে তাহাদের অজ্ঞানের আবরণটা অপেক্ষাকৃত পাতলা হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত সহজেই তাহাদিগকে ভগবানের ও আত্মার সত্যের দিকে ফেরান যায়। আর কোন্ দেশে বুদ্ধের সমুচ্চ ও কঠিন সত্য-সকল এত দ্রুত জনসাধারণের মনকে অধিকার করিতে পারিত? আর কোথায় তুকারাম, কবীর, শিখগুরু, তামিল সাধু—ইহাদের গভীর ভক্তি এবং গভীর দার্শনিকতা এত দ্রুত সাড়া তুলিতে এবং সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিত? ইউরোপেও কয়েকবার আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেক বারই সে ঢেউ আসিয়াছে প্রাচ্য হইতে, বিশেষতঃ ভারত হইতে, এবং প্রত্যেক বারই ইউরোপ সেই আধ্যাত্মিকতার সারটুকুকে বর্জ্জন করিয়াছে, তাহাকে ঐহিক জীবন ও প্রগতির কাজে লাগাইয়াছে। প্রাচ্য হইতে ইউরোপে প্রথম ঢেউ আসে গ্রীকদর্শনের ভিতর

দিয়া। পিথাগোরাস্ হইতে প্লেটো ও নিয়ো-প্লেটোনিষ্ট্ গণ যে প্রধানতঃ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন একথা আজকাল সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। ইহারই ফল হয় গ্রীস্ ও রোমের সমুজ্জ্বল সভ্যতা। কিন্তু সে সভ্যতার স্বরূপ হইয়াছিল ঐহিক, আধ্যাত্মিক নহে। তবে তাহা দ্বিতীয় ঢেউটির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল—সে ঢেউ ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অভিযান। প্রাচ্য হইতে তৃতীয় ঢেউ গিয়াছিল যখন মুসলমানেরা স্পেন জয় করে—তাহারই ফল হইয়াছিল ইউরোপে ক্যাথলিক অভ্যুত্থান। চতুর্থ ঢেউ আধুনিক যুগে জার্ম্মাণ দর্শনের ভিতর দিয়া ইউরোপে বেদান্ত প্রচার। যাঁহারা বলেন ভারতীয় সভ্যতার "প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে" তাঁহাদের সেটা দৃষ্টিবিভ্রম। ঐহিক জীবনের চূড়ান্ত অধঃপতনের অবস্থাতেও ভারতীয় সভ্যতা জগজ্জয়ের যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। পাশ্চাত্যের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার উপর বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের যোগ সাধনার দিকে পাশ্চাত্য মন ক্রমশঃ বেশী বেশী আকৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson-এর মত সম্বন্ধে Grant Duff

বলিয়াছেন—"His vital urge is a clever assimilation and adaptation of the Tantric notion of Siva-Shakti to European tastes".

আদর্শ মানবসমাজ গঠন করিতে হইলে দর্শন ও ধর্ম্মকে তাহার আরম্ভ ও ভিত্তি করিতেই হইবে; কারণ কেবল এইগুলিই মূল সত্যের সন্ধান দিতে পারে। ইহাদের প্রাধান্য দূর করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মানুষ সকল সময়েই সত্যের সন্ধান করিবে কারণ ঐটি হইতেছে তাহার জাগ্রত চৈতন্যের অপ্রতিরোধ্য নীতি; আর মানুষ যাহাকে সত্য বলিয়া জানিবে তাহাকে ধর্ম্মে পরিণত করিবেই। দর্শন হইতেছে বুদ্ধির দ্বারা মূল সত্যের সন্ধান এবং ধর্ম্ম হইতেছে মানুষের জীবনে কার্য্যতঃ সেই সত্যকে প্রয়োগ করিবার প্রয়াস। আজও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে—জগতে ইহার প্রাধান্য ছিল ধনিকতন্ত্রের যুগ পর্য্যন্ত, ঐ তন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত হইবে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের যুগ ত আরম্ভ হইয়াছে সেইদিন, বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন large-scale production, বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন আরম্ভ হইল তখনই ধনিকতন্ত্রের আরম্ভ হইল। তাহার পূর্ব্বে কি

ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা জগতে ছিল না? ভারতের প্রাচীন পল্লীজীবনে গ্রামবাসী নিজেদের জমি চাষ করিত, নিজেদের কুটীরশিল্প চালাইত—গ্রামের সকল লোক মিলিয়া গ্রামের সকল সাধারণ কার্য্য পরিচালন করিত এবং নিজেদের আয়ের কতকটা অংশ সরাসরি রাজাকে খাজনা দিত। ইহা ধনিকতন্ত্র নহে, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজিমেরই আদিম রূপ—কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন বিরোধই ছিল না, বরং ধর্ম্মই ছিল তাহার ভিত্তি। রুষিয়ায় আজ যে ধর্ম্মবর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা হইতেছে সে পরীক্ষার ফল এখনও বাহির হয় নাই, আর তাহার লক্ষণও খুব ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কম্যুনিজিমের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার সহিত যে-গুলির নিবিড় সম্বন্ধ ছিল যেমন বৌদ্ধসঙ্ঘ, Christian Communes—এইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হইয়াছে। মার্ক্স যে ধর্ম্মবর্জ্জিত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন তাহার ভিত্তি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জড়বাদ—মার্ক্সের দর্শন ছিল এই জড়বাদ এবং হেগেলের দার্শনিক অভিব্যক্তিবাদের একটি জগাখিচুড়ী। জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞানের

কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই—কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আপাতদৃশ্য বস্তু লইয়াই তাহার কারবার; তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া জড়বাদের প্রচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর সেই Mechanical determinism—যাহার উপর মার্ক্সের থিওরি প্রতিষ্ঠিত—তাহা এখন উড়িয়া গিয়াছে, আজিকার বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে একটা Indeterminism বা অনিশ্চয়তার সন্ধান পাইয়াছে, প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জগতের মূলে যে-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অন্ধ জড়শক্তি নহে, তাহা চৈতন্যময়। আজও যাঁহারা মার্ক্সবাদ লইয়া মাতামাতি করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এখনও সে তত্ত্ব পৌছায় নাই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া যাহাই বলুন, মানুষের যে গভীরতম অনুভূতি উপলব্ধি তাহাতে চৈতন্যই জগতের চরম সত্য বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে; জড় হইতেছে বস্তুতঃ চৈতন্যেরই একটি রূপ, একটি অভিব্যক্তি—অন্নং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্যের সত্য, কিন্তু জগৎও মিথ্যা নহে, জগৎও সত্য, জগতে জীবন ও কর্ম্মও সত্য। এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন পথ ধরিয়াছে। পাশ্চাত্য

জাতি জীবনের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছে, এবং একসময়ে সব ছাড়িয়া শুধু জীবনের সত্যকেই ধরিয়াছে, আত্মার সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলিয়া এক কোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। এখন তাহারা সেই অতিমাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। প্রাচ্য আত্মার সত্যের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছে, এবং কিছুকাল, অন্ততঃ ভারতবর্ষে, আর সব ছাড়িয়া কেবল সেই সত্যটিকেই ধরিয়াছে, জীবনের সম্ভাবনা-সকলকে অবহেলা করিয়াছে, অথবা জীবনকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচ্যও এখন এই অতিমাত্রতা হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেছে। পাশ্চাত্য জাতি আত্মার সত্য এবং জীবনের অধ্যাত্ম সম্ভাবনা-সকল সম্বন্ধে পুনর্জ্জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, প্রাচ্য জাতি জীবনের সত্য সম্বন্ধে পুনর্জ্জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অধ্যাত্ম-সম্পদকে নূতনভাবে জীবনের উপর প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই যে প্রভেদ ইহা হইতেছে কৃত্রিম। আত্মাই যখন মূলগত সত্য তখন জীবন কেবল তাহারই অভিব্যক্তি হইতে পারে; কিন্তু এখন আমরা জীবনের যে-স্বরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ নহে,

মানুষের দেহ, প্রাণ, মন তাহার আত্মাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার তাহাকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে জ্ঞানে বর্দ্ধিত হইতে হইবে যতক্ষণ না এই অসম্পূর্ণতা দূর হয়, মানুষের দেহ, প্রাণ, মন অধ্যাত্মশক্তি ও গুণে বিকশিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে আত্মার অভিব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্র হইয়া উঠে। দিব্য জীবনের পরিপূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে মানব জীবনের সত্য নীতি; পার্থিব জীবনকে দিব্য জীবনের রূপে গড়িয়া তোলা—ইহাই হইতেছে মানুষের ক্রমবিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এইটিই হইতেছে তাহার মূলকথা।

এই সত্যকে তত্ত্ববিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, দার্শনিক তথ্যকেই আর সব কিছুর ভিত্তি করা প্রয়োজন—সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ "The Life Divine"* শীর্ষক নিবন্ধকেই প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। জগতের দার্শনিক সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি হইয়াছে একটি অপরূপ জিনিষ। আত্মা, মন ও জীবন সম্বন্ধে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্তের শিক্ষা লইয়াই ইহার আরম্ভ। কিন্তু

* এই অমূল্য গ্রন্থখানি সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে জীবনকে অস্বীকার করা হয়, এবং এই ব্যাখ্যা শঙ্করের মায়াবাদেই চরমে উঠিয়াছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, "এই সবই ব্রহ্ম"—এই সত্য হইতে আরম্ভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত মায়াবাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, এই জগৎ ব্রহ্ম নহে, ইহা অ-ব্রহ্ম, অনাত্ম। শ্রীঅরবিন্দ এই স্ব-বিরোধী মত গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করের মায়াবাদের প্রতিবাদ ইতিপূর্ব্বে অনেকেই করিয়াছেন—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যেমন সম্পূর্ণভাবে ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন এমনটি আর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। রামানুজের অনুসরণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন—এরূপ কথার মূলে কোন সত্য নাই। বস্তুতঃপক্ষে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের সহিতই শ্রীঅরবিন্দের মিল বেশী। কারণ রামানুজের মতে জীব হইতেছে ভগবান হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ভেদই সব, অভেদ কোথাও নাই—আর শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের ন্যায়ই বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মই। শঙ্কর জগতকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন জগৎও ব্রহ্ম—এইখানেই শঙ্করের সহিত শ্রীঅরবিন্দের পার্থক্য। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব

আচার্য্যগণ জগতের যে বাস্তবতা স্বীকার করেন, শঙ্করের সহিত তাহার তফাৎ খুব বেশী নহে—কারণ শঙ্করও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব দর্শনগুলির ভিত্তি সাংখ্য দর্শনের উপর—একথাও সত্য নহে, তাহাদেরও ভিত্তি হইতেছে বেদান্ত। রামানুজ নিম্বার্ক, মধ্ব—এঁরা সকলেই ছিলেন বৈদান্তিক। বস্তুতঃ আমাদের দেশে সাংখ্যমতের প্রভাব অনেক পূর্ব্বেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীতায় আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানযোগ বলিতে সাংখ্যকেই বুঝা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের প্রচারের ফলে সাংখ্যমত চাপা পড়িয়া যায়, তাহার পর আবার যখন হিন্দুদর্শনের অভ্যুত্থান হয় তখন শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদান্তই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এখন জ্ঞানযোগ বলিতে সেই বেদান্তই বুঝায়, সাংখ্য নহে। এই বেদান্ত ও জ্ঞানযোগের প্রচলিত মত এই যে, এই জগৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সৃষ্ট, ইহার স্বরূপ হইতেছে দুঃখময়, মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইতেছে এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ নিবারণ করা, এই জগৎকে এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়া যাহাতে আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত—সকলেরই এই মত। শঙ্করের সহিত রামানুজ প্রভৃতির

প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে জগৎ আদৌ সৃষ্ট হয় নাই উহা অবিদ্যা-কল্পিত, ইহার অস্তিত্ব কেবল মানুষের মনে— যতক্ষণ অজ্ঞান আছে ততক্ষণই ইহার অস্তিত্ব; অন্যান্যের মতে জগৎ বস্তুতঃ সৃষ্ট হইয়াছে*। কিন্তু কার্য্যতঃ এই দুই মতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই কারণ উভয় মতেই এই জগতের মূল হইতেছে অবিদ্যা—এবং এই জগৎকে ছাড়িয়া যাওয়াই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। শঙ্করের মতে জীব জগৎকে ছাড়াইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব জগৎকে ছাড়াইয়া গোলকে বা বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে চির-আনন্দে বিরাজ করিবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন, মানবজীবনের যাহা লক্ষ্য, যাহা পূর্ণতম পরিণতি তাহা হইবে এই জগতে, এই মাটির পৃথিবীতে—অন্য কোথাও নহে। তিনি দেখাইয়াছেন, এই জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে, অবিদ্যা-প্রসূত নহে—এই জড় জগতের প্রতি অণু পরমাণু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দ্বারা অনুস্যূত। তাঁহার এই মত তিনি কোন দর্শনশাস্ত্র বা দর্শনাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া

* রামানুজের মতে চিৎ জীব এবং অচিৎ জগৎ—দুইই হইতেছে ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ বিভিন্ন; আত্মা যেমন দেহ হইতে বিভিন্ন—ব্রহ্মও তেমনিই জীব ও জগৎ হইতে বিভিন্ন।

পান নাই—স্বয়ং ভগবান তাঁহার এই দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিলেন যখন তিনি আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহার সেই সময়কার অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত "উত্তরপাড়া অভিভাষণে" বলিয়াছেন:—

"তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।...দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম—চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম।"

তাঁহার এই দিব্য দৃষ্টি লইয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সব মত প্রচার করিয়াছেন—বহুকাল হইতে যে-সবের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব

চলিয়া আসিতেছে, সে-সব মত প্রকৃতপক্ষে হইতেছে একটি সমগ্র সত্যের এক একটি দিকের আভাস। সেই সমগ্র সত্যের মধ্যে তিনি সকল মতের যে সমন্বয় পাইয়াছেন, তাঁহার Essays on the Gita গ্রন্থে তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। সেই মত অনুসারে ব্রহ্ম সত্য; জীব এবং জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে? অন্ততঃ ইহাই যে গীতার অদ্বৈত, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সমন্বয় ও সমগ্র দৃষ্টি সুলভ নহে, গীতায় বলা হইয়াছে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা। সাংখ্যমত অনুসারে অচিৎ জড়স্বভাবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই হইতেছে এই জগতের মূল। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুইটি মতে যে সূক্ষ্ম প্রভেদই থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ ও ব্যবহারিক সাধনায় বিশেষ কোন প্রভেদই হয় না। উভয় মত অনুসারেই এই জগৎ হইতেছে মূলতঃ অজ্ঞান ও দুঃখের আগার, অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা এই জগতের জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। শঙ্করের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রভেদ

এই যে, শঙ্কর সাংখ্যেরই ন্যায় জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির উপরেই জোর দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের বেদান্ত ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, জগতের মূল শক্তি অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা অচিৎ নহে—তাহা হইতেছে ভগবানের চিৎশক্তি, গীতায় তাহাকে পরাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই পরাপ্রকৃতিই Supermind বা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আত্মা হইতে দেহ, প্রাণ, মনকে প্রকট করিয়াছে, এই বিজ্ঞানই সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে। মানুষের মন বিকশিত হইয়া যখন এই অতিমানস বা বিজ্ঞানে পরিণত হইবে তখনই মানুষ জগতের প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্যে উপনীত হইতে পারিবে এবং জীবনের উচ্চতম নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছে সচ্চিদানন্দ, তাহার সহিত জগতের কোন অলঙ্ঘ্য বিরোধ নাই; কেবল এখন আমরা জগৎকে অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতেছি, এইটিই প্রকৃত মায়া, আমাদিগকে জ্ঞানের চক্ষু দিয়া জগৎকে দেখিতে হইবে। আমাদের অজ্ঞানও হইতেছে জড়ের নিশ্চৈতন্য হইতে পূর্ণ চৈতন্যে উঠিবার মধ্যবর্ত্তী স্তর, ইহা জ্ঞানেরই একটি অপূর্ণ অবস্থা। মানুষ যাহাতে পূর্ণ চৈতন্যে উপনীত হইতে পারে, মানবজীবনে

আধ্যাত্মিকতাকে প্রকট করিতে পারে, জন্মের পর জন্ম সে তাহারই সুযোগ লাভ করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল সত্যটি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রকট করিবার জন্যই জড়ের মধ্যে বীজরূপে দেহ, প্রাণ, মন অনুস্যূত হইয়াছে এবং সেখান হইতে বিবর্ত্তনের দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। এই বিকাশের চরম পরিণতি ও চূড়া হইতেছে অধ্যাত্ম জীবন, the life divine *।

এই সকল সত্য যে ভারতের প্রাচীন বৈদান্তিক-সত্যের বিরোধী নহে তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেদ, উপনিষদ্ ও গীতার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। আর দার্শনিক সত্যকে যদি জীবনে প্রয়োগ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না, সেই জন্য শ্রীঅরবিন্দ The Synthesis of Yoga নামক নিবন্ধে বিভিন্ন অধ্যাত্ম সাধনার স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয়

* কোরাণের মধ্যে আমরা এই গভীর অর্থপূর্ণ কথাটি পাই—Youma tubaddalul ardu ghair al ard অর্থাৎ "সেদিন এই পৃথিবীই এক নূতনতর পৃথিবীতে পরিণত হইবে।"

করিয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনকে গঠন করিয়া পূর্ণ দিব্য জীবনে উপনীত হইতে পারে তাহার ব্যবহারিক প্রণালীটি দেখাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা ও অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে দূরে থাকিতে চান তাঁহাদের একটি সাধারণ অজুহাত হইতেছে এই যে, নানামুনির নানামত, আমরা কোন্ পথের অনুসরণ করিব? কিন্তু এই নানামতেরও সার্থকতা আছে—সমগ্র সত্যকে মানুষ একেবারেই ধরিতে পারে না, তাই এক সময়ে এক একটা দিক ধরিয়া তাহার চরমে যাইতে হয়, তাহার পর আসে একটা সমন্বয়ের যুগ তখন মানুষ সত্যকে অনেকটা সমগ্রভাবে ধরিতে পারে। শঙ্করের মত ও সাধনা এইরূপই একটা ঐকান্তিক ধারা—তাহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে—শঙ্কর কেবল সেই বৈদান্তিক সত্যের একটা দিকের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে যতই সাময়িক ক্ষতি হউক, সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্ম জীবন বিকাশের জন্য তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মের উপর, ব্রহ্মের নিশ্চল শান্তি, নীরবতা, ঐক্য, নিষ্ক্রিয়তার উপরেই জোর দিয়াছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগৎ ব্রহ্মের যে dynamism-এর দিক, বহুত্ব,

সক্রিয়তা, শক্তির দিক তাহার উপরেই অত্যধিক জোর দিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ যদি আত্মার শান্ত প্রতিষ্ঠা না থাকে, সে কর্ম্ম হয় দুঃখ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং অশেষ অনিষ্টকর। পাশ্চাত্য জগৎ ইহা এখন উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শঙ্করের বেদান্ত সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ উপনিষদের সেই প্রাচীন সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সগুণভাব ও নির্গুণভাব, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয় শান্তি দুইই সমানভাবে সত্য ; যখন মানুষ ইহা উপলব্ধি করিবে, যখন তাহার বাহিরের কর্ম্ম ভিতরের শান্ত অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে উৎসারিত হইবে, তখনই তাহার জীবন ও কর্ম্ম দিব্য হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, যত রকম অধ্যাত্মসাধনা আছে, সাধারণতঃ যাহাদিগকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই সত্য আছে—যত মত তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে সকল সাধন প্রণালীর ঐক্যটি দেখাইয়া দিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়া, সকল সাধনার বহিরঙ্গ দিকগুলিকে ছাড়িয়া, তাহাদের মূল শক্তি আহরণ করিয়া যে সর্ব্বযোগ-সমন্বয় তাহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগ।

কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল ব্যক্তিগত সাধনার কথা। শ্রীঅরবিন্দ যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন মানব জাতির সামাজিক জীবনে তাহা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই সকল সত্য কেমন নিগূঢ়ভাবে মানব সমাজের বিবর্ত্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে, শ্রীঅরবিন্দ The Psychology of Social Development নিবন্ধে তাহা বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। ইউরোপে সমাজের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের অন্ত নাই। বস্তুতঃ ইউরোপের মন হইতেছে অতিশয় সক্রিয়, সকল বিষয়েই তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু মানুষের মন হইতেছে একটি অজ্ঞানের যন্ত্র, ইহা শুধু প্রশ্ন তুলিতে পারে, অনুসন্ধান করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। মন যে-সব আংশিক বিকৃত সত্যে উপনীত হয় তাহা সাময়িকভাবে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তাহার দ্বারা কোন প্রশ্নের চরম সমাধান হয় না এবং মানব-জীবনের কোন সমস্যার চরম নিষ্পত্তি হয় না। ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ। যতক্ষণ না মানুষ এই মনকে বিকাশ করিয়া অতিমানস বিজ্ঞান-শক্তি লাভ করিতেছে—ততক্ষণ মানব-

জীবনের প্রকৃত রূপান্তর ও উন্নতিসাধন সম্ভব নহে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে, তেমনিই সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা লোকে নানা থিওরি বা মতবাদ দাঁড় করাইতেছেন—কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, বংশনীতি, ভৌগলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বাহ্য বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি দেওয়ায় কাহারও মতই ধোপে টিকিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, এ-সবই হইতেছে বহিরঙ্গ—উপলক্ষ্য ; মানব সমাজের বিবর্ত্তন প্রকৃতভাবে পরিচালিত হয় মানুষের আভ্যন্তরীণ চৈতন্যবিকাশের গতি অনুসারে—সেই জন্যই তিনি তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, The Psychology of Social Development. এই দিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানব সমাজের বিকাশ পর পর চারিটি স্তরের ভিতর দিয়া চলে—প্রথম প্রতীকতার (Symbolism) যুগ, দ্বিতীয় শাস্ত্র ও আচারের যুগ, তৃতীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, চতুর্থ আধ্যাত্মিকতার যুগ *। এই সব স্তরের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ

* চৈতন্যের দিক দিয়া সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রথমে আরম্ভ করেন জার্ম্মাণীরই একজন মনীষী, তাঁহার নাম Lamprecht—কিন্তু তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

আসিয়াছে—মানুষ এখন আর শাস্ত্র বা গতানুগতিক আচার না মানিয়া নিজেদের অন্তরের মধ্যে গিয়া সত্যের সন্ধান করিতে এবং নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ সত্য অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। এই প্রবৃত্তি যদি বিপথে চালিত না হয়, পুনরায় মানুষ নূতন রকম আচার-তান্ত্রিকতার গর্ত্তে পতিত না হয়—তাহা হইলে ইহার পরেই আসিবে আধ্যাত্মিকতার যুগ এবং তথনই মানুষের আদর্শ-সমাজের স্বপ্ন সফল হইবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জগতের আজ প্রধান সমস্যা হইতেছে মানব জাতির কোন রকম ঐক্য সাধন—যেন জগৎ হইতে যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যায়, মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি-সকল বিকাশ করিবার সুযোগ পায়। এই দিকে কি সব প্রবৃত্তি কাজ করিতেছে, তাহাদের ত্রুটি কোথায়, কি করিলে মানব-জাতির প্রকৃত ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে শ্রীঅরবিন্দ The Ideal of Human Unity নামক নিবন্ধে এই সব প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে জগতের সকল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তিনি যে-ভাবে নিজের বক্তব্যগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন, জগতের রাজনৈতিক সাহিত্যে আর

কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে না। Arya পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধে তিনি যে-সব ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী ঘটনাধারায় তাহাদের সত্যতা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীন বিকাশের প্রবৃত্তি আছে তেমনিই অপরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবারও প্রবৃত্তি আছে, ব্যষ্টিও যেমন সত্য, সমষ্টিও তেমনই সত্য—উভয়ের ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ হইতেছে। মানবের প্রথম সমষ্টিরূপ হইতেছে পরিবার, তাহার পর কুল, উপজাতি—শেষে আসিয়াছে Nation বা অধিজাতি, এইভাবে মানুষ ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সমষ্টি জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। সেই একই প্রেরণাতে সমগ্র মানব জাতির এক সমষ্টিগত জীবন গড়িয়া উঠিবে। বাহ্যিক শৃঙ্খলা বজায়ের জন্য একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র বা বিশ্ব-সম্মিলন গঠনের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে তাহা যদি জগতের জাতি-সকল পরস্পরের সহিত বুঝা পড়ার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তোলে তাহা হইলে এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় ক্ষতি ও দুঃখ ভোগের মাত্রা ন্যূনতম হইবে—নতুবা প্রকৃতি অনবরত বিভ্রাটজনক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের

ভিতর দিয়া মানুষকে তাহাতে উপনীত হইতে বাধ্য করিবে, কেবল তাহাতে ক্ষতি ও দুঃখভোগের মাত্রা অধিকতম হইবে। কিন্তু যে-ভাবেই মানবজাতির বাহ্য ঐক্য সাধিত হউক, যদি মানুষের আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের পরিবর্ত্তন না হয়, এখন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যে অহমিকার দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা বর্জ্জন করিয়া আত্মার সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়—তাহা হইলে কোন ঐক্যই স্থায়ী হইবে না, মানব জাতির দুঃখ ভোগেরও অবসান হইবে না।

আধ্যাত্মিকতা যে মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন এবং ভারত যে জগতের অন্য সকল দেশের তুলনায় আধ্যাত্মিকতার অধিক বিকাশ করিয়াছে সে-বিষয়ে এখন আর তর্কের স্থান নাই। তথাপি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেওয়ায় ভারত ইহ-বিমুখ হইয়াছে, ঐহিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই অভিযোগের চূড়ান্ত জবাব দিয়াছেন তাঁহার A Defence of Indian Culture নিবন্ধে এবং এই সূত্রে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন তাহা ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা, রাজনীতি,

সমাজ-নীতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব দিক্‌নির্দর্শন। ভারতে আধ্যাত্মি-কতা জীবনকে নিরুৎসাহ করে নাই বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিবারই প্রেরণা দিয়াছে*। তাহার ফলে ভারত ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক সংগঠন, ঐহিক শক্তিতে যে সীমায় উঠিয়াছিল—আধুনিক যুগের পূর্ব্বে আর কোন দেশ, কোন সভ্যতাই তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় ভারতের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। বিজ্ঞানে ভারত অন্য সকল দেশের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল এবং আরবদের ভিতর দিয়া ইউরোপকে জড়বিজ্ঞানে দীক্ষা দিয়াছিল। তাহার সাহিত্যও অতি মহান্। বেদ, উপনিষদ, গীতার তুলনা ত জগতের সাহিত্যে আর কোথাও মিলিবে না—তাহা ছাড়া আমাদের রহিয়াছে রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, এবং অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অতি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি। ভারতের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলার

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহাই হইতেছে ভারতীয় সভ্যতার সমগ্র আদর্শ; জীবনের সর্ব্বতোমুখী ভোগ ও বিকাশকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ মোক্ষ বা অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ইতিহাস সুদীর্ঘ। সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ অবিরাম সৃষ্টি ভারতীয় সভ্যতার মহান প্রাণশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু শুধু এই সকল উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রেই নহে, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনেও ভারত একটা জীবন্ত শক্তিমান জাতি যাহা কিছু করিতে পারে সবই চূড়ান্তভাবে করিয়াছে—যুদ্ধ করিয়াছে, শাসন করিয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সকল রকম পরীক্ষা করিয়াছে, সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছে। অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-জাতি, যে-সভ্যতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এইরূপ কর্ম্মশক্তি, সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই প্রাণ-শূন্য বা জীবন-বিরোধী ছিল না।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপরতার পর স্বভাবের নিয়মে যখন ভারতীয় জাতির প্রাণশক্তি সাময়িকভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ঠিক সেই সময়ে শঙ্কর আসিয়া তাঁহার মায়াবাদ প্রচার করায় ভারতের জাতীয় জীবনে সমধিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শঙ্করের পূর্ব্বে বৌদ্ধেরাও সন্ন্যাসবাদ প্রচার করিয়াছিল—কিন্তু তখনও জাতির প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, হিন্দুরা বরাবর বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল

এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে পারে নাই। শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণতি—তাই অনেকে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। বৌদ্ধদের শূন্য এবং শঙ্করের নির্গুণ, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নহে। তাহা ছাড়া বৌদ্ধরা দার্শনিকতা হিসাবে নির্ব্বাণকে বড় বলিলেও জীবন ও কর্ম্মকে শঙ্করের ন্যায় নিরুৎসাহ করে নাই। বুদ্ধের নীতিশিক্ষা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করিবার দিব্য শিক্ষা। বৌদ্ধধর্ম্মের যে নিছক নিরাত্মবাদ ও নিবৃত্তিমূলক স্বরূপ উহা বেশীদিন টিকে নাই *। অশোকের শিলালিপিতে সন্ন্যাসমূলক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহাতে সর্ব্বত্র প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তি-মূলক বৌদ্ধধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের এই পরিবর্ত্তন

* অনুরূপ কারণেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সন্ন্যাসবাদ ইউরোপের ক্ষতি করিতে পারে নাই। জীবন ও কর্ম্মের দিকে পাশ্চাত্য জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য তাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নৈতিকতা ও সেবা ধর্ম্মের দিকটিই গ্রহণ করিয়াছিল—নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতা মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হয়। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও পরোপকারের কাজ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে আলেক্জান্দ্রিয়া ও গ্রীস্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে আমরা যে পরোপকার ও সেবাব্রতের মহিমা দেখিতে পাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই জগতে প্রথম তাহার পথ দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই নূতন মতটিই স্বভাবতঃ অধিকাধিক লোকপ্রিয় হয়; যাহারা সংসার ও কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিজেদের নির্ব্বাণলাভের সাধনায় ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদের নাম হইল "হীনযান," এবং এই নূতন পন্থার নাম হইল "মহাযান"। বৌদ্ধধর্ম্মের যত কিছু কীর্ত্তি ও গৌরব আসিয়াছে এই "মহাযান" পন্থা হইতে *। ইহা মূলতঃ গীতার কর্ম্মযোগ—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থে গীতার অনেক কথা শব্দশঃ গৃহীত

* হীনযান ও মহাযান এই দুই পন্থার ভেদ বর্ণনাকালে ডাঃ কের্ণ বলেন—"Not the Arhat who has shaken off all human feeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisatva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests"—*Manual of Indian Buddhism.*

হইয়াছে। চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে আজও এই মহাযান পন্থাই প্রচলিত আছে। পরে শঙ্কর যে মত প্রচার করিলেন তাহা বৌদ্ধ হীনযানেরই অনুরূপ; কিন্তু তিনি তাহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করায় হিন্দু জনসাধারণ সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আর তিনি যেমন সমুচ্চ প্রতিভা ও অসাধারণ কর্ম্মশক্তি লইয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র নিজ মত প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এমনটি এ-পর্য্যন্ত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তিনি গীতার কর্ম্মযোগের বিকৃত ব্যাখ্যা করিলেন—সংসারের সকল কর্ম্মকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞানের উপর জোর দিলেন। যাহারা নিতান্ত অক্ষম তাহাদের পক্ষেই সংসারধর্ম্ম ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মমার্গের ব্যবস্থা রাখিলেন। অর্জ্জুন যখন তামসিকতায় আচ্ছন্ন, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ করিতে উন্মুখ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই মনোভাবকে ক্লৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়া তাঁহাকে এক বিরাট কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন। আর ভারতীয় জাতি যখন তামসিকতায় মগ্ন হইতেছে তখন শঙ্কর তাহাদের সেই ক্লৈব্যকেই প্রশ্রয় দিয়া সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাসবাদ প্রচারে জাতির কোন ক্ষতিই হয় না—কারণ কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট লোকই ঐ সকল উচ্চতর সাধনা বা চর্চ্চা লইয়া থাকে, সাধারণ লোক নিজেদের চাষবাস বেচাকেনা লইয়াই থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। মানুষ যে স্তরেই থাকুক না কেন—জীবনের, জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার এবং সেই অনুসারে জীবনকে চালিত করিবার একটা গভীর প্রেরণা তাহার মধ্যে আছে। বিশেষতঃ ভারতের লোকের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শঙ্করের মায়াবাদের দার্শনিক চর্চ্চা খুব বেশী লোক করে নাই—কিন্তু তাহার মূল কথাগুলি যাত্রা, গান, কথকতা, লোক-সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের চাষারা লাঙ্গল ধরিতে ধরিতে গান করে,

কোন্ অপরাধে এ-দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল্।

অথবা,
মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।

এমন অসংখ্য গান চাষী, দোকানী, মালী, নাপিত সকল শ্রেণীর লোকের মুখেই শুনা যায়, ইহাদের ভাব হইতেছে

—এই সংসার একটা কারাগার স্বরূপ, কর্ম্ম এখানে বন্ধনের শৃঙ্খল, এই সাংসারিক জীবন নরকতুল্য, ইহা ছাড়িয়া যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সকলেই যে এই শিক্ষা অনুসারে সংসার ছাড়িয়া যায় তাহা নহে কিন্তু সংসার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া যাহারা সংসার করে তাহাদের দ্বারা সংসারে বড় কাজ কিছুই হয় না। কোন রকমে নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া সঙ্কীর্ণভাবে দিনগত পাপক্ষয় করাই হয় জীবনের স্বরূপ। গত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের জীবনধারা মোটের উপর এইরূপ ক্ষীণ স্রোতেই চলিয়াছে। ভারতের সম্পদ সেদিন পর্য্যন্তও যে খুব বেশী ছিল তাহার কারণ এদেশের মত সুজলা, সুফলা, সর্ব্বরত্নমণ্ডিতা দেশ জগতে আর কোথাও নাই। যাহাতে মানুষকে জীবিকার জন্য বেশী বেগ না পাইতে হয়, নিশ্চিন্তভাবে তাহারা উচ্চ চিন্তা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেইজন্যই ভগবান যেন ভারতকে স্বর্ণপ্রসবিনী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী কর্ম্মশক্তি হারাইয়া নিজেদের সম্পদ রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই—তাই আজ শোষণে ও পেষণে তাহাদের দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে।

কিন্তু মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদের দিন শেষ হইয়াছে—এতদিন ধরিয়া ভারত যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে

তাহাতে আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ গঠনের সমস্ত উপাদানই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের যাহা ত্রুটি ছিল পাশ্চাত্যের প্রভাবে তাহা সংশোধিত হইয়াছে —আজ আসিয়াছে প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এক মহান সমন্বয়ের দিন। শ্রীঅরবিন্দ Arya পত্রিকায় এই সমন্বয়েরই বিশাল ও গভীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জনসাধারণের ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক দার্শনিক ধর্ম্ম নহে, তাহা হইতেছে লোকাচার, দেব-দেবীর পূজা, লৌকিক ধর্ম্ম। কিন্তু যদি আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনকে এই ভাবে আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে চলিবে না—জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে ভিতরের আত্ম-সত্যের অভিব্যক্তি করিতে হইবে। আর যে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের ও কর্ম্মের এইরূপ সমন্বয় হইতে পারে তাহা মায়াবাদ নহে; মায়াবাদ বলে এই জগৎ যেমন আছে, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুতে পূর্ণ—ইহা চিরকাল এমনই আছে, এমনই থাকিবে—ইহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা বৃথা, এই জীবনের কোনই সার্থকতা নাই, not worth living, মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে এই জীবনকে ছাড়াইয়া নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নীরব

ব্রহ্মে চিরদিনের জন্য লীন হওয়া বা নির্ব্বাণ লাভ করা। তাই যাঁহারা মানবসমাজকে আদর্শভাবে গঠন করিতে চান তাঁহাদিগকে মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মায়াবাদ শুক্‌নো"। তিনি "চিনি হইতে এবং চিনি খাইতে" দুইই চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য, আমি দুইটাই লই, নইলে ওজনে কম পড়ে।" শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টি লইয়া বেদ, উপনিষদ, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুভূতিকেই উচ্চতম দার্শনিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ জগতের সর্ব্বত্রই আদর্শ মানবসমাজ গঠনের নানা প্রয়াস, নানা পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নটিকে যেমন সমগ্রভাবে ধরিয়াছেন, সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন, সকল জ্ঞান, সকল সভ্যতা, সকল ধর্ম্মের মূলশক্তি আহরণ করিয়া এক বিরাট সমন্বয় করিয়াছেন এমনটি আর এ-পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। তাই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী Romain Rolland বলিয়াছেন, "The completest synthesis that has been reached to this day, of the genius of Asia and of the genius of Europe".

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃন্বন্তু বিশ্বে।"

শ্রীঅরবিন্দ ভাবী সমাজের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার সহায় হইবে মানবধর্ম্ম, A religion of humanity. আধুনিক যুগে এই ধর্ম্মটিই হইতেছে অন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রবল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় rationalists বা যুক্তি-পন্থীদের মনে এই ধর্ম্ম জন্মলাভ করে, তাঁহারা যাজকীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই মানব ধর্ম্মের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। আধুনিক positivism ও humanitarianism হইতেছে ইহারই অভিব্যক্তি। পরোপকারব্রত, সমাজসেবা এবং অনুরূপ কর্ম্ম হইতেছে ইহার অনুষ্ঠান; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, pacifism বা শান্তিবাদ—এ-সব অনেকটা এই ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, অন্ততঃ ইহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইতে বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে। এই ধর্ম্মের মতে মানব জাতিকেই দেবতারূপে বরণ করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে। মানুষের সেবা করা, মানুষকে সম্মান করা, মানবজীবনের উন্নতিসাধন করা—

ইহাই হইতেছে মানবাত্মার প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান লক্ষ্য। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় এই ধর্ম্মের মূল কথা,

শুনহে মানুষ ভাই!

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

অন্য কোন দেবতা,—জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার—কিছুকেই মানুষের উপর স্থান দেওয়া চলিবে না, মানুষের সেবায় ইহারা কতটুকু লাগিতে পারে তাহাতেই এ সবের সার্থকতা। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষ্টি—সবেরই লক্ষ্য হইবে মানুষের সেবা। যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড, নরহত্যা, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বা সমাজ কর্ত্তৃক মানুষের উপর সকল প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ, শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ও নৈতিক নিষ্ঠুরাচরণ, যে-কোন অজুহাতে কোন মানুষকে, কিম্বা কোন শ্রেণীর মানুষকে হীন বা অবনত করিয়া রাখা, মানুষের উপর মানুষের, শ্রেণীর উপর শ্রেণীর, জাতির উপর জাতির সকল প্রকার অত্যাচার ও শোষণ—পূর্ব্বকালে যে-সব কার্য্যতঃ ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের দ্বারা নানা ভাবে সমর্থিত হইয়াছে—এ-সবকেই মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধে পাপ, জঘন্য অপরাধ বলিয়া পরিগণনা করা হইবে, সকল সময়েই এ-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিছুতেই আর এ-সবকে বরদাস্ত করা হইবে না। মানুষের শরীরকে

সম্মান করিতে হইবে, অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে, বিজ্ঞানের দ্বারা রোগ ও নিবার্য্য মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে হইবে; মানুষের জীবনকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে, শক্তিমান করিতে হইবে, মহান্ ও সমুন্নত করিতে হইবে। মানুষের হৃদয় ও অনুভূতিকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে, বিকাশের ক্ষেত্র দিতে হইবে; মানুষের মনকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে স্বাধীনতা ও প্রসারিত ক্ষেত্র ও সুযোগ দিতে হইবে, আত্ম-শিক্ষা ও আত্ম-বিকাশের সকল উপায় করিতে হইবে, তাহার সকল শক্তিকে মানুষের সেবার জন্য সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে হইবে। মোটামুটি এইটিই হইতেছে বুদ্ধিপ্রসূত যৌক্তিক্ মানবধর্ম্ম। দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে মানুষের জীবন ও চিন্তা ও অনুভূতি কিরূপ ছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই মানবধর্ম্ম কি মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহার কাজ কিরূপ সুফলপ্রসূ হইয়াছে। পুরাতন ধর্ম্মগুলি যাহা করিতে পারে নাই ইহা দ্রুত তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই ধর্ম্মের আছে মানবজাতি ও

তাহার পার্থিব ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস—এবং সেজন্য ইহা মানব সমাজের প্রগতিতে সাহায্য করিতে পারে ; অন্যপক্ষে প্রাচীন গোঁড়া ধর্ম্মগুলি মানুষকে পরকালের ভরসা দিয়া জীবনের সকল দুঃখ সহ্য করিতে, এমন কি দুঃখ ও নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারকে ডাকিয়া আনিতেও উৎসাহ দিয়াছে !

কিন্তু মানবধর্ম্মকে যদি তাহার কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে চলিবে না—এরূপ থাকিলে তাহা জনসাধারণের হৃদয়কে অধিকার করিতে এবং মানবজীবনের সাধারণ নীতি হইয়া উঠিতে পারিবে না—তাহা কেবল কতকগুলি উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির উপরেই প্রভাব বিস্তার করিবে। আর সেভাবে তাহার যে প্রধান শত্রু, সকল প্রকৃত ধর্ম্মেরই যাহা প্রধান শত্রু—ব্যক্তির অহমিকা, শ্রেণীর অহমিকা, জাতির অহমিকা—তাহাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে পারিবে না। সেজন্য তাহাকে আত্মার সত্যের উপর, আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—সকল মানুষ যে মূলতঃ এক আত্মা এবং ভগবানের সহিত এক, এই অনুভূতির উপরেই প্রকৃত মানব প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এবং এই প্রেম ও ঐক্যবোধই হইতেছে মানবধর্ম্মের, সকল সত্য-ধর্ম্মের প্রাণ। যতদিন না মানব-

চৈতন্যের রূপান্তরের দ্বারা ভিতরে এই ঐক্যবোধ ও মৈত্রী সিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততদিন বাহিরে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের দ্বারাই প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—আর যখন ইহা সিদ্ধ হইবে তখন বাহ্য প্রতিষ্ঠান-সকলের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও নব-সৃষ্টি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইবে, এখনকার মত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়া সে-সবের জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস করিতে হইবে না।

এই অধ্যাত্ম মানবধর্ম্মের প্রকৃষ্ট শাস্ত্র হইতেছে গীতা। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া আমিই রহিয়াছি—যাহারা মূঢ় তাহারাই 'মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্' আমাকে অবজ্ঞা করে *। সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে যে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, সকলের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহাকে সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সহিত ঐক্যে সকলের সহিত

* বাইবেলে আছে—God has created man in His own image. কোরাণে আছে—Nafakhtu fi hi min ruhi. "I breathed unto him of my breath." এই মানবধর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম ও সভ্যতার মিলন-সূত্র।

জীবন্ত ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—এই প্রেম ও ঐক্যবোধের উপর যে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই হইবে আদর্শ সমাজ। এই আদর্শ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদের মন্ত্রেই প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

—ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২ – ৪

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা কও। তোমাদের মন, তোমাদের মত এক হউক। প্রাচীন দেবগণও এইরূপে একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি এবং হব্য দ্বারা হোম করিতেছি।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ কর।

ইহাই ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্র। সমগ্র মানবজাতির প্রতি ইহাই বৈদিক ঋষিগণের চিরন্তন বাণী।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ব্যাখ্যা অবলম্বনে

শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—(অভিনব বিরাট সংস্করণ) প্রথম খণ্ড (১ম অধ্যায়) ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা এবং দ্বিতীয় খণ্ড (২য় অধ্যায়) ২৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা দুই আনা।

"এই গীতাখানিতে মূল, অন্বয় ও সরল অনুবাদ ব্যতীত মূল শ্লোকের প্রধান প্রধান শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল, অভিনব ও সময়োপযোগী……আঠার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা এইরূপে সম্পূর্ণ হইলে এই গ্রন্থাবলী অপূর্ব্ব গীতা-সাহিত্য ও বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব্ব সম্পদ্ হইবে।" —**স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, "উদ্বোধন"**

"প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা খুব কম সংস্করণেই দেখিয়াছি"

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

"এই ধরণের আলোচনা মূলক শাস্ত্রব্যাখ্যান আমাদের বাংলা ভাষায় বেশী নাই……সবল দৃষ্টিভঙ্গী, সংশয়-জর্জ্জর মানুষকে স্থৈর্য্য ও সামর্থ্য দান করবে।" —**জয়শ্রী**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)—মূল শ্লোক, অন্বয়ের সহিত অনুবাদ এবং প্রত্যেক শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সরল ভাষায় বর্ণিত। মূল্য ১।০।

শ্রীঅরবিন্দ

(জীবন ও যোগ)

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা

সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের অত্যাশ্চর্য্য জীবনকাহিনী। জাতির প্রাণে নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার করিবে।

"Very inspiring reading . . . I am sure all spiritual aspirants would like very much to read them."—*Swami Tapasyananda, Sri Ramakrishna Mutt.*

"A valuable addition to devotional literature. It is no small pleasure to us to recommend this useful book for the perusal, study and meditation by every sadhaka. It is priced moderately for the supreme value of its contents."—*The Vision.*

Mother India. 8 as.

"A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror."—*Sri Aurobindo.*

"I have read the book several times and am profoundly impressed. Your purpose was to awaken the slumbering soul of India. . . . In this you have eminently succeeded."—*Dr. R. C. Mazumdar, M.A., Ph.D., Vice-Chancellor, Dacca University.*

India's Mission in the World. 12 as.

"Excellent small book . . presents a true India with her imperfections and possibilities before our eyes."—*Liberty.*